ওয়েস্ট বনহফ

কাজী জহিরুল ইসলাম

ছুটতে ছুটতে প্রিস্টিনা বিমানবন্দরে পৌছে গেলাম। কিউ তখন অনেক লম্বা। আমরা দু'জন বিশাল কিউ'র পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বিনে পয়সার শাটল প্লেনে চড়া অতো সোজা নয়। একে একে সবাইকে বোর্ডিং পাস দিচ্ছে হলুদ এপ্রন পরা মুভকন অফিসার। যখন আমাদের বোর্ডিং পাস নেওয়ার পালা, লোকটি ওর হাতের তালিকাটি পরীক্ষা করে বলে, 'তোমাদের নাম নেই। আমি দুঃখিত, তোমরা এই ফ্লাইটে যেতে পারছো না।' ততোক্ষণে আমাদের পেছনে আরো দশ/বারজন দাঁড়িয়ে গেছে। পেছনের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে ও বললো, 'যদি শেষ পর্যন্ত আসন খালি থাকে তোমাদের একটা সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।'

যতোটা না দুঃখ পেলাম, অপমানিত হলাম তার চেয়ে অনেক বেশী। আমি কিউ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলাম। বিমানবন্দরে কয়েকটি এয়ারলাইন্সের কাউন্টার আছে। অস্ট্রিয়ান এয়ারলাইন্স, আলিটালিয়া, আদ্রিয়া, সব কাউন্টারে খোঁজ নিয়ে দেখলাম আজ আর কোন ফ্লাইট ভিয়েনা যাবে না। আমরা চাইলে রোম যেতে পারি। ততোক্ষণে আমাদের নাকের ডগা দিয়ে হেঁটে হেঁটে বোর্ডিং পাস নিয়ে খুরশিদ এবং বোখারী অবতরণ কক্ষে চলে গেলো। এক বাড়িতে থাকি চার বাঙালী, অথচ এ দু'জন আমাদের না জানিয়ে গোপনে গোপনে ওএসসিই'র শাটল ফ্লাইটে রিজার্ভেশন করেছে, এখন ছুটি কাটাতে চলেও যাচ্ছে। আনোয়ারুজ্জামান নাছোড়বান্দা। 'খাড়ান, ওই মাইয়া দুইটারে ফোন করি। হারামজাদী মাগীরা কৈলো লিস্ট এয়ারপোর্টে পাঠাইছে, অহন আমগো নাম নাই ক্যা?' আমার খুব মন ভেঙে গেল। দানিয়ুভ নদীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে দেখবো পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতার আঁতুরঘর। হলো না। হাতের ট্রলি ব্যাগটাকে খুব অসহ্য লাগছে।

ভিয়েনার পাতালরেল উঠে এসেছে উপরে

আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে কিউ থেকে বের করে দিয়েছে। আমার চেহারা এখন দেখার বস্তু। সবাই হা সেই বস্তু দেখছে। হাতের ব্যাগটা না থাকলে বোধ হয় অপমানটা আড়াল করা যেত। হয়ত কেউ বুঝতোই না, আমি ভিয়েনা যাওয়ার জন্য মাগনা প্লেনে চড়তে এসেছিলাম। সব রাগ এখন এই ব্যাগটার ওপর। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে এসেছি, কাচের দেয়ালের ওপাশে জামান ভাই দুই হাত দুলিয়ে আমাকে ডাকছেন। তার ডাকের মধ্যে এক্ষুণি যেতে হবে, এইরকম একটা তাড়াহুড়ো। আমার পা চলছে না। আমি আসলে আর ভেতরে ঢুকতে চাইছি না। উল্টো তাকে ইশারা করলাম চলে আসতে। এবার তিনি চোখ-মুখ খিচিয়ে ইশারা করলেন, দ্রুত ওখানে যাওয়ার জন্য।

'ওই মিয়া এতো মন খারাপ করলে চলে নি। অরাতো ঠিকই লিস্ট পাঠাইছে, আমগো নামও আছে। এয়ারপোর্টের এই হালারা পুরান লিস্ট লৈয়া লাফালাফি করতাছে। এই লন বোর্ডিং পাস।' বলেই আনোয়ারুজ্জামান আমার হাতে একটি বোর্ডিং পাস ধরিয়ে দিলো। এরপর আমার হাত ধরে এক দৌড়। এখনি প্লেন ছেড়ে দেবে।

ওয়েসট বনহফের একটি স্ট্রিট

বিকেলের রোদে সাদা মেঘগুলোকে লাগছে সমুদ্রের ফেনার মতো। সেই ফেনা আমাদের পায়ের নিচে। আকাশের ফেনা মাড়িয়ে দুই ঘন্টার উড়াল শেষে ভিয়েনা এসে পৌছলাম। ভিয়েনা ইমিগ্রেশন আমাদের গলায় ঝোলানো জাতিসংঘের আইডি কার্ডকে যথেষ্ট সমীহ করলো, খটাশ খটাশ করে পাসপোর্টে স্ট্যাম্প মেরে দিলো। এখনো চারজনের দুটি দল, উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁটছি। আমি জানি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের মিল হয়ে যাবে। কারণ আমরা সবাই এখন একটি অচেনা ভূ-খন্ডে। অচেনা জায়গায় চেনা মানুষের দরকার হয়, এই চারজনই এখানে চারজনের সবচেয়ে চেনা মানুষ।

সবকিছু কেমন উলট-পালট লাগছে। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে একটি ম্যাপ হাতে নিয়ে আমরা এদিক-সেদিক আগন্তুকের মতো তাকাচ্ছি। একটি আঠাশ-ত্রিশ বছর বয়সী ফিলিপিনা মেয়ে এগিয়ে এসে বললো, 'কোন সাহায্য করতে পারি, মনে হচ্ছে এই প্রথম এলে?' এ জাতীয় মেয়েদের সম্পর্কে আমার জানা আছে। প্রথমে ভাব জমাবে, তারপর কোন এক আড়ালে নিয়ে সব কেড়ে নেবে। আমি বললাম,

‘ধন্যবাদ, আমরা ঠিকই আছি।’ খেকিয়ে উঠলো আনোয়ারুজ্জামান। ‘কি ঠিকই আছি? কিছুই ঠিক নাই। মহিলা আওগাইয়া আইলো সাহায্য করণের লেইগা, খুইলা কন আমরা পথ-ঘাট চিনি না, ইওরোপ দেখতে আইছি।’

এই লোককে কিভাবে বোঝাই যে, ওরা ভালো মেয়ে না, বড় শহরে এই রকম মেয়েরা নানান ধান্দায় ঘোরে। আনোয়ারুজ্জামানের উত্তেজিত কণ্ঠ মেয়েটিকে আমাদের প্রতি আগ্রহী করে তুললো। আমি উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে আছি। বোখারী বললো, ‘আমরা ভিয়েনা শহরের প্রধান রেলস্টেশনে যেতে চাই। তুমি কি বলতে পারো কিভাবে যাবো?’ ‘নিশ্চয় পারি। এসো আমার সাথে’। তিনজনই ট্রলির হাতলে টান দিলো। আমি আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকি কেন?

আমাদের গলায় ঝোলানো আইডির দিকে নির্দেশ করে মেয়েটি বললো, ‘ওগুলো এখন খুলে পকেটে রেখে দিতে পারো। এখানে তোমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না।’ ও কি কিছুটা খোঁচা মরালো, জাতিসংঘকে? আজকাল জাতিসংঘ নিয়ে এখানে-সেখানে কত কথাইতো হচ্ছে। অনেকগুলো এসকেলেটরে ওপর-নিচ করে আমরা বিমানবন্দরের ভূ-গর্ভস্থ রেলস্টেশনের একটি লেন-এ এসে দাঁড়ালাম। মেয়েটি একে একে আমাদের চারজনের সাথে হ্যান্ডশেখ করলো। ওর নাম বললো, মারিয়া। আমরাও আমাদের নাম বললাম।

ভিয়েনার রাস্তা

‘তোমাদেরকে ওয়েস্ট বনহফ যেতে হবে।’ এরি মধ্যে আমরা আমাদের ভিয়েনা আগমনের কারণ ওকে জানিয়ে দিলাম। ইউরো রেলে চড়ে ইওরোপ ঘুরতে চাই। হাতে সময় দু’সপ্তাহ। মারিয়ার পেছন পেছন আমরা একটি পাতাল রেলে চড়লাম। এখন অফিস ছুটির সময়, ট্রেনে কোন বসার জায়গা নেই। কিছুক্ষণ পর একটি স্টেশনে ট্রেন থামলো। ওর পেছন পেছন আমরা নেমে পড়লাম। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে

উঠে আবার নিচে নামলাম। অন্য একটি লেনে দাঁড়াতেই আরেকটি ট্রেন এলো। আমরা এবারও ওকে অনুসরণ করে দ্বিতীয় ট্রেনে উঠে পড়লাম। ও আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? সত্যি সত্যি ওয়েস্ট বনহফে, না অন্য কোথাও, এই শহরের কোন অন্ধকার গলিতে? এই ট্রেনেও প্রচন্ড ভিড়। গায়ে গায়ে লেগে আছে মানুষ। ট্রেনের ওপরে সমান্তরাল দুটি রডের মধ্যে প্লাস্টিকের হাতল লাগানো। দাঁড়ানো যাত্রীরা যাতে ওগুলো ধরে দাঁড়াতে পারে। আমি এবং মারিয়া মুখোমুখি। অন্যরা গলা থেকে আইডি খুলে ফেললেও আমার আইডি তখনো গলায় ঝুলানো। ভিড়ের ধাক্কায় আমার আইডিটা গলায় উঠে আছে। এক হাত ব্যাগে অন্য হাত রডের হাতলে। মারিয়া আমার গলা থেকে আইডিটা নামিয়ে দিতে গিয়ে নামটা পড়লো, 'কাজী ইসলাম..... তুমি কি কবিতা লেখ?' 'হোয়াট?' আমি আসলে ওর প্রশ্নটি বুঝলাম কি-না এইটা বুঝতেই অনেক সময় লেগে গেল। দূর ইওরোপের অচেনা এক শহরের ততোধিক অচেনা এক মেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছে কবিতা লিখি কি-না, এর চেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা আর কি হতে পারে?

ওয়েস্ট বনহফ এসে গেছে। আমরা ট্রেন থেকে নেমে যাচ্ছি। মারিয়া পরের কোন স্টেশনে যাবে। ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। ও দরোজায় দাঁড়িয়ে মুখ বের করে বললো, 'আমি মারিয়া অগাস্টিন, তোমাদের ট্রান্সপোর্ট সেকশনের....' ট্রেনের দরোজা বন্ধ হয়ে গেল। ওর পরের কথাগুলো বাতাসে মিলিয়ে গিয়ে ট্রেনের ভিতরে ঘুরপাক খাচ্ছে। পাতাল রেলের অন্ধকার লেনের ভেতর মারিয়ার ট্রেন হারিয়ে গেল। তখন বুঝতে পারলাম, মারিয়া আমাদের সাথেই প্রিস্টিনা থেকে একই শাটল প্লেনে এসেছে। ও আমাদের ট্রান্সপোর্ট অফিসার অগাস্টিনের স্ত্রী। ওরা ভিয়েনাতে সেটলড। অগাস্টিনও একজন কবি, আমরা প্রায়ই কবিতা বিষয়ক আড্ডা দিই প্রিস্টিনার কফিহাউসগুলোতে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
১৯ মে, ২০০৭